দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 22 NOV 1998 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭ ......

সমস্যাপূর্ণ দেশের বেসরকারী কলেজ নিয়ে কে কি ভাবছেন

কাজী হাবিবুল্লাহ্

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষাই জাতির ভবিষ্যৎ। সর্বস্তরের হতাশা দূরীকরণে শিক্ষা। দারিদ্র বিমোচনে শিক্ষা। জীবনের জন্য শিক্ষা। দেশ নিয়ন্ত্রণে ও উন্নয়নে শিক্ষা। বর্তমান দেশের শিক্ষা বিস্তারে বেসরকারী কলেজগুলোই প্রধানতম ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু ক্যানসারের মত নানাবিধ জটিল সমস্যায় বেসরকারী কলেজের ভবিষ্যৎ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। অচিরেই এর চিকিৎসা না হলে ভয়াবহ পরিনাম অনিবার্য।

সম্প্রতি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করে এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। উক্ত প্রতিবেদনে শিক্ষকদের ক্লাস গ্রহণে অনীহা, ক্লাসে পাঠ উপস্থাপনা ও পরিকল্পনা অত্যন্ত খারাপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে পরিচালনা পরিষদের বিরোধ থাকায় শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে বলেও ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। বেসরকারী কলেজকে পরিচালিত করে শিক্ষা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এছাড়া ব্যান- বেইস, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং জেলা প্রশাসন ও তত্ত্বাবধান করে থাকে। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত দপ্তর- সমূহে যারা চাকরি করেন তাদের কারও বেসরকারী কলেজে চাকরির অভিজ্ঞতা নেই। ফলে বেসরকারী কলেজের সমস্যাগুলো তাদের অগোচরেই থেকে যাচ্ছে এবং দিন দিন পুঞ্জীভূত হচ্ছে। পরিনামে শুভঙ্করের ফাঁকির মত অনেক কিছুই ঘটছে যার সম্বন্ধে সরকার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে।

বেসরকারী কলেজের অধ্যক্ষের চাকরি অত্যধিক সম্মানের তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে তার চতুর্দিকের সংশ্লিষ্টরা তাকে যে সন্দেহ করে চলেন সে বিষয়েও কোন দ্বিমত নেই। অধ্যক্ষের নাম উচ্চারণের সাথে সাথেই একটা অজানা সন্দেহ তার প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়। মনে করা হয় অধ্যক্ষ মানেই কেমন ধরনের একটা কিছু। এই অজানা সন্দেহের আক্রোশে বেশীর ভাগ অধ্যক্ষের কর্মতৎপরতা, দক্ষতা,স্বকীয়তা মারাত্মকভাবে নষ্ট হয়ে তিনি একটি কৃত্রিম মানুষে পরিণত হন। অধ্যক্ষ পদ গ্রহণের পর তিনি কেমন আছেন এর উপর কোন সমীক্ষা চালাবার প্রয়োজনীয়তা কেউ আজ পর্যন্ত অনুভব করেনি। তবে আমি সীমিত গন্ডিতে কয়েকজন অধ্যক্ষের খোঁজ নিয়ে যতটুকু জেনেছি তাতে দেখেছি যার রাত্রে সুনিদ্রা হ'ত-এখন হয় না, যিনি নিরোগ ছিলেন-তিনি নতুন নতুন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। যিনি টেনশনমুক্ত ছিলেন-এখন তিনি টেনশনগ্রস্ত হয়েছেন। একজন নামকরা সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ একটা প্রকট রোগে আক্রান্ত হয়েছেন বলে জেনেছি- যা তার কোনদিনই হবার কথা ছিল না। এ পদের কোন আত্মতৃপ্তি নেই। অধ্যক্ষগণ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী অসহায়।

বেসরকারী কলেজের একজন অধ্যক্ষ অধিক বয়সে লজ্জা ঝেড়ে ফেলে প্রবল প্রতিযোগিতামূলক ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে চাকরি গ্রহণ করেন। চাকরি গ্রহণ করে তিনি শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি, সভাপতি ও পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দের মনোনয়ন দান করেন। কিন্তু অচিরেই শিক্ষক, কর্মচারী ছাত্র/ছাত্রী ও সদস্যগণ অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এমনকি সভাপতি স্বয়ং অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হন। কলেজের পার্শ্ববর্তী লোকেরা পর্যন্ত অধ্যক্ষের প্রতি কটাক্ষ করেন এরং পরিশেষে অধ্যক্ষ একা হয়ে পড়েন। সম্পূর্ণ একা হয়েই তিনি কলেজ চালাতে থাকেন। সদস্যবৃন্দ, শিক্ষকগণ সকলেই অধ্যক্ষের কাছে একটা সুবিধা পাবার অধিকার চান। তারা অবিরত অধ্যক্ষের ভুল-ক্রটি খোঁজ করে বেড়ায়। আর অধ্যক্ষ যেহেতু মানুষ-তাঁর ভুল-ক্রটি তো হবেই। তবে যে সব কলেজের সদস্য ও শিক্ষকগণ নিঃস্বার্থ হয়ে অধ্যক্ষের সহায়তার জন্য তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান দেশ ও জাতির স্বার্থে তাদেরকে পুরস্কৃত করা উচিত।

অধ্যক্ষের নাম উচ্চারণের সাথে সাথেই একটা অজানা সন্দেহ তার প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়। মনে করা হয় অধ্যক্ষ মানেই কেমন ধরনের একটা কিছু। এই অজানা সন্দেহের আক্রোশে বেশীর ভাগ অধ্যক্ষের কর্মতৎপরতা, দক্ষতা, স্বকীয়তা মারাত্মকভাবে নষ্ট হয়ে তিনি একটি কৃত্রিম মানুষে পরিণত হন। অধ্যক্ষ পদ গ্রহণের পর তিনি কেমন আছেন এর উপর কোন সমীক্ষা চালাবার প্রয়োজনীয়তা কেউ আজ পর্যন্ত অনুভব করেনি। তবে আমি সীমিত গন্ডিতে কয়েকজন অধ্যক্ষের খোঁজ নিয়ে যতটুকু জেনেছি তাতে দেখেছি যার রাত্রে সুনিদ্রা হ'ত-এখন হয় না, যিনি নিরোগ ছিলেন-তিনি নতুন নতুন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

কতিপয় বিষয়ে শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাগণ অধ্যক্ষদেরকে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করে থাকেন। বেশ কয়েক বৎসর ধরে শিক্ষাবোর্ড ও অধ্যক্ষদের মধ্যে ছাত্র/ছাত্রীদের নিবন্ধন ও ছাড়পত্র সংক্রান্ত বিষয়ে বিরোধ প্রবল আকার ধারণ করেছে এবং অধ্যক্ষদের বেতন পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। যতদিন ছাত্র/ছাত্রীরা পরীক্ষা দেবে ততদিন এ দু'টি সমস্যা অব্যাহত থাকবে। এটা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। এ বৎসর যশোর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় পরীক্ষার আগের দিন পর্যন্ত কয়েকজনকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন। কারণ তিনি ভুক্তভোগী ছাত্র ও তার অভিভাবকদের বক্তব্য স্বয়ং শুনে অধ্যক্ষ কতটুকু দায়ী তা সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। যখনই নিবন্ধন ও ছাড়পত্র সংক্রান্ত জটিলতার উদ্ভব ঘটে তখনই সরকারী কলেজ থেকে আগত বোর্ডের কর্মকর্তাগণ ধরে নেন যে, এর পিছনে অধ্যক্ষের নিশ্চয়ই কোন আর্থিক সুবিধার ঘটনা রয়েছে। তবে তারা আজ পর্যন্ত কোন সরকারী কলেজের অধ্যক্ষের প্রতি কারণ দর্শানো নোটিস জারি করেননি। কিন্তু বেসরকারী কলেজের সব অধ্যক্ষই যে অর্থযুক্ত কর্মকান্ডে অভ্যস্ত নন এবং শুধু অধ্যক্ষ এর সাথে কতটুকু দায়ী, তেমনি শিক্ষা বোর্ডের কর্মচারী ও কলেজের কর্মচারী কতটুকু জড়িত, শিক্ষা বোর্ডের কর্মচারীদের উপর কর্মকর্তাদের কতটুকুই বা নিয়ন্ত্রণ সেটা তারা অনুধাবন করতে রাজী নন। মূলত সমস্যা সমাধানে আন্তরিকতার অভাব এবং দায়িত্ব এড়াবার প্রবণতা সংশ্লিষ্ট সকলকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

অবৈধ ফরম পূরণের অভিযোগে ১৯৯৫ সনের যশোর শিক্ষা বোর্ডের ৮৩ জন অধ্যক্ষের শাস্তির ঘটনা এখানে প্রণিধানযোগ্য। তৎকালীন চেয়ারম্যান প্রফেসর হাসান ওয়ায়েজ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গোপনে এক পত্র প্রেরণ করে যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনস্থ ৮৩ জন অধ্যক্ষের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ ব্যতিরেকে বেতন- ভাতা বন্ধ করেন। চেয়ারম্যান মহোদয়ের গোপনীয় চিঠিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ০১-৮-৯৫ ইং তারিখ থেকে বেতন স্থগিত করেন এবং ১৯-১২-৯৫ ইং তারিখের অন্য এক পত্রে অধ্যক্ষগণ নির্দোষ প্রমাণিত হলেও তার এক বৎসরের বেতন অবশ্যই পারেন না বলে আদেশ দেন। প্রফেসর হাসান ওয়ায়েজ মোটেই বুঝতে যাবেন না যে, ৮৩ জন অধ্যক্ষের মধ্যে হয়তো একজনও নির্দোষ থাকতে পাবেন। তিনি এদের প্রতি এতই বিরক্ত হন যে, কাউকেই কারণ দর্শানো নোটিস পর্যন্ত জারির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। ০১-৮-৯৫ ইং তারিখ থেকে বেতন স্থগিত কার্যকর হবার পর তিনি গভর্নিং বডির সভাপতিকে ১৭-৯-৯৫ ইং তারিখে পত্র দিয়ে অধ্যক্ষদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। যে সকল অধ্যক্ষ নির্দোষ তাঁদের অনুরোধে গভর্নিং বডির সভাপতি তদন্ত করে অধ্যক্ষকে শাস্তির অযোগ্য বললেও শাস্তি আগেই বলবৎ হয়ে যায়। অতঃপর এক বৎসর পূর্ণ হবার আগেই ১০ মাস ২৩ দিন পরে ৪৯ জন অধ্যক্ষের বেতন ছাড় দেয়া হয়। পরবর্তীতে সম্ভবত আরও ২৪ জনকে ছাড় দেয়া হয়। শোনা যায়, অভিযুক্তদের কেউ কেউ বেতন উত্তোলন করেছিলেন। প্রকৃত নির্দোষরা ১০ মাস ২৩ দিনের ৬৬,০৫৩.৫০/=টাকা আজও উত্তোলন করতে না পেরে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাধ্য হয়ে বিক্রি করে ভরণ-পোষণ চালিয়েছেন। আজও নির্দোষ অধ্যক্ষদের তদন্ত রিপোর্টসহ বেতন প্রাপ্তির আবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পড়ে আছে। এভাবেই বিচারের বাণী নিরবে-নিভৃতে কাঁদে।

বেসরকারী কলেজকে উদ্দেশ করে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, উপরে আল্লাহ্ আর নিচে গভর্নিং বডি। কলেজের প্রতি গভর্নিং বডির সদস্যদের অগাধ দাবী আর ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য। বক্তব্যে দিনকে রাত করার নিরন্তর প্রতিযোগিতা। সদস্যগণ কলেজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে অতন্দ্র পাখা বিস্তার করে থাকেন। উচ্চ মাধ্যমিক পাবলিক পরীক্ষার সময় সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা সম্পন্নের নিমিত্তে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও গভর্নিং বডির সদস্য সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই কমিটি অনেক দাবী নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করেন এবং অন্যকে প্রবেশের সহায়তা করেন। ১৯৯৮ সনের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এ ধরনের কমিটি গঠনের নির্দেশ রহিত করা হয়েছে। এভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আজ নতুন করে গভর্নিং বডি রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করার সময় এসেছে। সরকারী কলেজসমূহে এ ধরনের গভর্নিং বডি নেই তাতে সেখানে কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

ঘাতক ব্যাধি নকল এখন একটি জাতীয় সমস্যা। এতদিনের অবহেলায় এর শিকড় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। ছাত্রদের কাছে এটা হয়েছে একটা রোমান্টিক ব্যাপার। শিক্ষকরা হয়েছেন লালনে অভ্যস্ত এবং সুকৌশলে দায়িত্ব এড়াতে তৎপর। অভিভাবকদের সার্টিফিকেট দরকার বিধায় হয়েছেন মৃদু ইন্ধনদাতা। আর গভর্নিং বডি? কোন বেসরকারী কলেজের গভর্নিং বডি নকল উচ্ছেদে ভূমিকা রেখে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এমন ঘটনা দেশে বিরল। এমন কোন ঘটনা দেখা যায়নি যে তারা শিক্ষকদেরকে অভিযুক্ত করে তাদের কাছে কৈফিয়ত চেয়েছেন বা ভৎর্সনা করেছেন। দেশের গোটা কয়েক কলেজে নকল হয় না- অন্যেরা বিদেশে যাচ্ছে; তারাই পরবর্তীতে দেশের সুপিরিয়র চাকুরীগুলি কব্জা করবে। বাকীরা ষ্টার মার্ক গলায় নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে এবং গোটা জাতির ভবিষ্যৎ নষ্ট করবে। তাই আত্মঘাতী নকলকে উচ্ছেদ করতে দ্রুত বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। কিন্তু কে নেবে এই দায়িত্ব?

বেসরকারী কলেজের শিক্ষক নিয়োগে গভর্নিং বডির অপ্রতিহত ক্ষমতা। দুইজন বিশেষজ্ঞের ও নিজেদের পছন্দ থাকে। যার ফলে যারা শিক্ষক হবেন বলে জীবনে কোনদিন আশা পোষণ করেননি তারা শিক্ষক হিসাবে তালিকাভুক্ত হন। শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিবেদনে শিক্ষকদের ক্লাস গ্রহণে অনীহার কথা এবং পাঠ উপস্থাপনা ও পরিকল্পনার প্রকট অভাব বলে উল্লেখ করেছেন। দেরীতে হলেও শিক্ষা অধিদপ্তর একটি প্রকৃত সত্য উদঘাটন করতে পেরেছেন। তারাই আজ নিজ হাতে নকল সরবরাহ করে ধরণীতে বিষবৃক্ষ রোপিত করছেন। অনেকে বক্তৃতা করেন কলেজের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। কিন্তু যারা প্রশিক্ষণ নিয়ে আসেন দেখা যায় তারাই এর বিপক্ষে মন্তব্য করেন। মূলতঃ শিক্ষক প্রশিক্ষণের চেয়ে শিক্ষক পরিদর্শন অধিক কার্যকরী। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়কে পরিদর্শন মহাবিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করাই এখন যুক্তিযুক্ত ও সময়োপযোগী। বেসরকারী কলেজে শিক্ষকদের গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণের বিধিও এখন পর্যন্ত প্রবর্তন হয়নি। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, শিক্ষকদের বেতন স্কেল অবশ্যই সরকারী কলেজের অনুরূপ হওয়া অপরিহার্য।

কলেজের বিজ্ঞান শাখা আজ অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে নিয়োজিত। কয়েক বৎসর পর বিজ্ঞানের শিক্ষক বিদেশ থেকে আমদানী করতে হবে। দশম শ্রেণীতে বিজ্ঞান পড়ে এসে একাদশ শ্রেণীতে ব্যবহারিক পরীক্ষার কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা বিজ্ঞান ত্যাগ করছে। একজন শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রের ব্যবহারিক খাতা পুড়িয়ে ফেলার খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীরা আজ শৃঙ্খলহীন ও অবাধ্যতায় অভ্যস্ত হতে শুরু করেছে। হতাশার সাগরে তারা হাবুডুবু খাচ্ছে। সকলের মুখে একটাই স্লোগান "লেখাপড়া শিখে কি হবে?" কোথায় যাচ্ছে তা তারা নিজেরাই জানে না। ক্লাশে তাদের অনুপস্থিতি ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারী কলেজেও দুপুর ১২টার পরে ছাত্র-ছাত্রী পাওয়া দুষ্কর।

ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সততা, উদারতা, আত্মবিশ্বাস, ন্যায়বিচার, দেশপ্রেম, দায়িত্ববোধ, নীতিবোধ, মূল্যবোধ ও চরিত্র গঠনমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। নেশা, সন্ত্রাস, অবাধ্যতা, ঘুষ, চুরি পরিহারের বাস্তবমুখী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। পন্ডিত, বিজ্ঞানী, মহৎ প্রাণ ব্যক্তিদের জীবনী পাঠ্যভুক্ত করতে দ্বিধা রয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও অনুপস্থিত। জাতিকে নেতৃত্ব কে দেবে তা ছাত্রদেরকে বোঝানো হচ্ছে না। শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মকে সুকৌশলে পরিহারের চেষ্টা করা হলেও ধর্মকে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ব্যবসায়ীর দুই হাত কর্তন, মদের টাকার জন্য পিতা প্রহৃত, ৭০ বছরের বৃদ্ধ কর্তৃক শিশু ধর্ষণ, শ্বশুর কর্তৃক পুত্র বধূ ধর্ষণ, ধর্ষিত কিশোরীর আত্মহত্যা, ১২ কোটি টাকা ঘুষ, বিমানবালার ব্যাগে ডলার, স্কুল ছাত্র-ছাত্রী নিখোজ প্রভৃতি খবরে এখন ধর্মের গুরুত্ব হাড়ে হাড়ে অনুভূত হচ্ছে। চাকুরী ক্ষেত্রে কোন ইন্টারভিউয়ের কোন প্রশ্নের উত্তরে জানি না বলা ক্ষতিকর; তেমনি ইমাম সাহেবের অনুপস্থিতিতে পিতার জানাজার নামাজ পড়াতে জানি না বলাও অন্যায়।

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম ক্রটি হল আত্মকর্ম সংস্থানে ছাত্র-ছাত্রীকে উদ্বুদ্ধ করা হয় না। ইলেকট্রিক কাজ, কাঠ মিস্ত্রী, দর্জি, এমনকি মাছের ব্যবসা করা অন্যায় নয়-এ ধরনের সাহসিকতা সৃষ্টি করার ব্যবস্থা নেই। উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে যদি সে উচ্চ শিক্ষার দরজায় ঢুকতে ব্যর্থ হয় তাহলে তাকে যেকোন কাজ করার উদ্যম, সাহস ও কঠোর পরিশ্রমের জন্য তৈরী করা অপরিহার্য। আজ পরিশ্রম বিমুখ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ ডিগ্রী নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা বেরিয়ে আসছে। তাদেরকে শুধু রঙিন স্বপ্ন দেখানো হয়েছে। বিশ্বের মহাপ্রাণ ব্যক্তিরা যে কঠোর পরিশ্রম করে কালজয়ী হয়েছেন সে উদাহরণ তাদের সামনে উপস্থাপিত হচ্ছে না। গাড়ী আর বাড়ীর নেশায় তারা বুদ হয়ে আছে।